



খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ মৃত্যু উপত্যকা

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

‘ফ্লাই ইং সসার’ শব্দটির সঙ্গে এক সময় আমরা পরিচিত ছিলাম। কালক্রমে ‘সসার’ আমাদের জীবন থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে। ‘সসারে’ করে ভিন গ্রহ থেকে প্রাণীরা আসতো পৃথিবীতে। ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আবার চলে যেত। পৃথিবীর মানুষ পেরে উঠতো না সসারের সঙ্গে। সব সময়ই তারা থেকে যেত ধরা-ছোয়ার বাইরে। সসারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল অনেক কিংবদন্তি। মূলত সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই সসারের গল্প শোনা যায় না। এখন আর জানা যায় না সসার আগমনের কাহিনী। তবে ‘সসার’ পৃথিবীর থেকে বিদায় নিলেও

বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেয়নি।

বাংলাদেশে মঙ্গল বা অন্য কোনো গ্রহ থেকে কিছু প্রাণীর আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। মাঝে-মাঝে আসছে এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আগে সসারে যাদের আসার গল্প শোনা যেত তারা সঙ্গে কোনোদিন বোমা বা গ্নেড এনেছিল কী না জানা যায়নি। অন্তত তারা কোনোদিন বোমা বা গ্নেড ছুঁড়ে মারেনি পৃথিবীর মানুষের ওপর। কিন্তু এখন বাংলাদেশে যারা আসছেন তারা সঙ্গে শক্তিশালী বোমা এবং গ্নেড নিয়ে আসছেন। এবং ছুঁড়ে মারছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর। বোমা আর গ্নেডের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে

বাংলাদেশের মাটি, মানুষ...।

গত ২২ আগস্ট ঘটে গেল এরকম একটি ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো আট-দশটি গ্নেড। কেঁপে উঠলো আকাশ-বাতাস। রক্তে ভিজে গেল পিচ ঢালা রাজপথ। রাজপথ শুষে নিল মানুষের রক্ত। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মানুষের হাত-পা, শরীর...। রাজধানীর কংক্রিটের বনে প্রতিধ্বনিত হলো মানুষের হাহাকার। জুতা-স্যান্ডেল-মানুষ একাকার হয়ে পড়ে রইলো রাজপথে। গ্নেড ছুঁড়ে ভিনগ্রহের প্রাণীরা চলে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে! হয়ত

‘সসারে’ তারা ফিরে গেল মঙ্গল বা অন্য কোনো গ্রহে!!

বাংলাদেশে যে বোমা কালচার শুরু হয়েছে সেটাকে এভাবে ছাড়া আর কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। শেখ হাসিনার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকে বোমা বা গ্রেনেড সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছি আমরা। এই সংস্কৃতি থেকে কোনো ভাবেই বের হয়ে আসতে পারছি না। একের পর এক ঘটনা ঘটছে। এর কোনো কুল-কিনারার সন্ধান করা যাচ্ছে না। যখন যারা সরকারে থাকছেন তারা আবোল তাবোল অনেক কথা বলছেন। শেখ হাসিনা যেমন বলেছিলেন, খালেদা জিয়াও তেমন বলছেন। কিন্তু আসল কাজের ধারে কাছেও শেখ হাসিনা যাননি, খালেদা জিয়াও যাচ্ছেন না।

আসল কাজটি কী?

কারা বোমা পেতে বা গ্রেনেড ছুঁড়ে মানুষ মারছে সেটা খুঁজে বের করা।

কারা খুঁজে বের করবে?

খুঁজে বের করার দায়িত্ব

সরকারের। অবশ্যই সরকারের।

এক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা কী হবে?

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারের

অংশ। সরকারকে তারা যতটা সম্ভব সহযোগিতা করবে। এটাই হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। আমাদের বিরোধীদলের কাজ শুধুই অভিযোগ করা। বিরোধী দলের বিরোধিতা করাটা না হয় মেনে নেয়া যায়। অবাধ করা ব্যাপার হলো আমাদের সরকারও শুধু অভিযোগ করে। ‘দেশ ও জনগণের শত্রুরা বোমা বা গ্রেনেড আক্রমণ করেছে’- সরকারের ভাঙা রেকর্ড শুনতে শুনতে দেশের মানুষের কান ঠসা হওয়ার অবস্থা। কিন্তু সরকার বিরতিহীনভাবে এই রেকর্ড বাজিয়েই চলেছে। অথচ দেশ ও জনগণের শত্রুকে সন্ধান করা হচ্ছে না! দেশ, জনগণের শত্রু তো অদৃশ্য কোনো বস্তু নয় যে তাদের খুঁজে বের করা যাবে না। তৈরি হচ্ছে রহস্য।

এই রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। জনগণের নেই। কারণ যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন তারা ‘রহস্য’টাকে সিন্দুক ভরে রাখে। জনগণের সামনে নিয়ে আসে না। এই রহস্যের সিন্দুক জনগণের সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের খুব ভয়। না জানি কখন অপ্রিয় সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের মিছিল পূর্ব সমাবেশে যে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটলো- এটা কী কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ যে কাউকে এ

প্রশ্ন করলে উত্তর আসবে ‘না’। এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের চেয়েও বড় প্রস্তুতি ছিল সরকারের। প্রায় হাজার খানেক পুলিশ ছিল সমাবেশ স্থলের চারপাশে। ডিজিএফআই, এসবি, এনএসআই, সিআইডি, ডিবির প্রায় শ’খানেক গোয়েন্দা তৎপর ছিল সমাবেশ স্থলে। অনেক আগে থেকেই তারা অবস্থান নিয়েছিল সেখানে।

গোয়েন্দাদের কাজটা কী?

কোনো ঘটনা ঘটানোর আগাম খবর সংগ্রহ করা। অথবা ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার কারণ বের করা।

সেদিন তাহলে সমাবেশ স্থলে গোয়েন্দারা করছিল কী? কেন



আমাদের গোয়েন্দারা আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। আমাদের গোয়েন্দাদের দক্ষতা বিষয়ে একটি অসাধারণ বাক্য বলে গেছেন হুমায়ুন আজাদ। তিনি গোয়েন্দাদের ‘ফেলুদা’ পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন

তাদেরকে এখানে আনা হয়েছিল? তাদের কী কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না? ওপর থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারা হয়েছে। বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলের ছবি দেখে সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী কেউ কেউ গ্রেনেড ছুঁড়ে দু’একজনকে দৌড়ে পালিয়ে যেতেও দেখেছেন। সাধারণ মানুষ যাদের দেখলো গোয়েন্দারা তাদের দেখলো না কেন? নাকি তারা দেখতে চায়নি। অথবা তাদের দেখার ক্ষমতা নেই। কোনটি সত্যি? সত্যি যাই হোক না কেন, সেটা বের করতে হবে সরকারকে।

আমাদের গোয়েন্দারা আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। এ কারণেই মনে হয় নিশ্চয় মঙ্গল গ্রহ থেকে কোনো প্রাণী এসে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেছে। তা না হলে কেন খুঁজে বের করা যাবে না, কেন ধরা যাবে না- এই মানবতা বিরোধী অপরাধীদের!

আমাদের গোয়েন্দাদের দক্ষতা বিষয়ে একটি অসাধারণ বাক্য বলে গেছেন হুমায়ুন আজাদ। তিনি গোয়েন্দাদের ‘ফেলুদা’ পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আজ হুমায়ুন আজাদের কথাটা বারবার মনে পড়ছে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের গ্রেনেড বিস্ফোরণ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এটা যে বিশাল পরিকল্পনার অংশ সেটা ঘটনাক্রম দেখলেই বোঝা যায়। একটি মহল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে চালিয়েছে এই আক্রমণ।

দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির

বিরুদ্ধে এই আক্রমণ। দেশের অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই এটা ছিল একটি ‘টার্গেট অ্যাটাক’। দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল বলেও মনে করার কারণ আছে। শেখ হাসিনা নিহত হলে ঘটনাবলী এখানেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। খোদ বেগম জিয়ার ক্ষমতা ধরেই টান দিত। এ ধরনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে কোনো তৃতীয় শক্তি ক্ষমতায় আসত কি না সেই প্রশ্ন উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। অতীতে বিভিন্ন দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে সে সব দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও সে ধরনের কোনো বিষয় ছিল কিনা সেই প্রশ্ন বড় করে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে গত কিছু দিন ধরে দেশব্যাপী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি যে একটা সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে তার সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে বলেই মনে হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে কিছু বিকৃত মস্তিকের মাওলানা পরিচয়ধারী কিছুসংখ্যক মৌলবাদী দেশে জঙ্গি শাসন কায়েমের চেষ্টা করছে। গোপনে নয় তারা সব কর্মকাণ্ডই করছে প্রকাশ্যে। তারা নিজেদের মৌলবাদী বলে দাবি করে। প্রকাশ্যে তারা তালেবানী শাসন কায়েম করতে চায় বাংলাদেশে। দেশের মানুষও তাদেরকে চেনে।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা মমতাজী, দেলোয়ার হোসেন সান্দী প্রমুখ। আওয়ামী লীগের সময়ে যখন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, তখন বলা হয়েছে মৌলবাদীদের কথা। অথচ এই পরিচিত মৌলবাদীদের ধরা হয়নি। নেয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা। আওয়ামী লীগের ভয় ছিল ভোট হারানোর। আওয়ামী লীগের কিছু না বলা নীতিতে বিকশিত হয়েছে এই অপশক্তি।

বর্তমান জোট সরকারের ক্ষমতার শরিক এই মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সন্ধান পাওয়া গেছে।

কোনো অপশক্তি যদি পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে, তার প্রকাশ কেমন হয় সেটা আমরা দেখেছি আফগানিস্তানে। এবারের গ্রেনেড আক্রমণের পর সেটার আলোমত বাংলাদেশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ তার ভুল বুঝতে পারছে। সম্ভবত নিজেদের অস্তিত্বের সংকটের বিষয়টি বুঝতে পারছে বিএনপিও। বিএনপি নেতারাও নিজেদের বিপন্ন বোধ করছে। বুঝতে পারছে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

তাই এখন আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিও চিন্তিত। আমরা বারবারই বলছি

জামায়াত ক্রমেই বিএনপিতে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করছে। বর্তমান সরকারের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত। সাকাটো জোট সরকারের ভয়ঙ্কর ক্ষমতাসালী সদস্য। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ফারুকদের সঙ্গে সাকাটোদের একটা ভালো সম্পর্ক সব সময়ই ছিল, এখনো আছে। ফ্রিডম পার্টি মূলত জামায়াত, সাকাটোদের শেল্টারেই বেড়ে উঠেছিল। প্রকাশ্যে তাদের কার্যক্রম ছিল না গত কয়েক বছর। ফ্রিডম পার্টি এখন আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নেতাক্যাডারদের অনেকেই অবস্থান করছেন ঢাকায়। জেল হত্যা মামলার রায় হবে ৭ সেপ্টেম্বর। যে দিন আওয়ামী সমাবেশে গ্লেনেড আক্রমণ হলো, সেদিনই ফারুকদের টিভি পর্দায় দেখা গেল হাসি মুখে। গ্লেনেড আক্রমণের সঙ্গে এই হাসির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা দেখার দায়িত্ব সরকারের।

বাংলাদেশে বিগত ১৯৯৯ সাল থেকে চলে আসা এ সকল বোমাবাজির ঘটনার টার্গেট যে অসাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে এ ধরনের প্রথম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে যশোরের উদীচীর সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। এই সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয়ে যশোরের দক্ষিণপশ্চিম মহলের বিরোধিতা ছিল। তারা এ ব্যাপারে হুমকিও দিয়েছিল। উদীচীর সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ যে দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি হামলা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের সঙ্গে মৌলবাদী সংগঠনের সম্পর্ক আছে বলে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ ঘটনার সঙ্গে বিরোধী দল বিএনপির নেতাকর্মীদের জড়িয়ে দেয়ার ফলে প্রকৃত রহস্য আর উন্মোচিত হয়নি।

উদীচীর ঐ ঘটনার পরই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুষ্ঠানস্থলে শক্তিশালী বোমা পাওয়া যায়। এর সঙ্গে মৌলবাদী সংগঠনের নেতা মুফতি হান্নানের যোগসূত্র পাওয়া যায়। ঐ মামলার চার্জশিট হয়েছে, কিন্তু অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ঐ বছরই খুলনার আহমদিয়া মসজিদে বোমার ঘটনায় ১০ জন প্রাণ হারায়। আহমদিয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে মৌলবাদী মহলের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কথা সবার জানা। খতমে নবুয়ত নামে সংগঠিত এই শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদিয়াদের মসজিদ দখলের ঘটনা ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি তারা চট্টগ্রাম ও খুলনায় ঐ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আগামী ২৭ অক্টোবর তারা ঢাকায় আহমদিয়া জামায়াতের প্রধান মসজিদ দখল করার কথা ঘোষণা করেছে। এই বোমা হামলা ও আক্রমণের ঘটনা যে সাম্প্রদায়িক

শক্তির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আহমদিয়া জামায়াতের অনুসারীরা বিশেষ করে জামায়াতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মান্ধ দল ও গোষ্ঠীর বিরোধী।

এর পরের ঘটনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। এবারের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল সিপিবি। ঢাকার পল্টন ময়দানে সিপিবির সমাবেশে ঐ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের কথা বললেও ঐ তদন্তও থেমে গেছে।

ঐ বছরই পয়লা বৈশাখ রমনার বটমূলে নববর্ষ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। টেলিভিশনের পর্দায় ঐ বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাংলা নববর্ষ পালন নিয়ে দেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর বিরোধিতার কথা সবার জানা। এ ব্যাপারে বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক ফতোয়া পর্যন্ত দিয়েছেন। বাঙালির ঐ অনুষ্ঠানকে নস্যাৎ করার এবং দেশবাসীকে এ ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে ঘরে তুলে দেয়ার জন্যই যে এ ধরনের হামলা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।



আওয়ামী লীগের সময়ে যখন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, তখন বলা হয়েছে মৌলবাদীদের কথা। অথচ এই পরিচিত মৌলবাদীদের ধরা হয়নি। নেয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা

এবারও ঐ ঘটনায় একটি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র গ্রেপ্তার হলেও পরবর্তীতে ঐ মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

এসব বোমা হামলা থেকে দেশের সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও বাদ পড়েনি। গোপালগঞ্জের বানিয়াচর গির্জায় প্রার্থনারত অবস্থায় এ ধরনের বোমা হামলার শিকার হন সেখানকার খ্রিষ্টানরা। ঐ ঘটনার তদন্তেরও কোনো অগ্রগতি নেই। এমনিতেই ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের বোমাবাজির ঘটনাকে আগামীতে আরও বাড়িয়ে তুলবে, আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করবে, সে ধরনের একটি পরিকল্পনা থেকে এ ধরনের বিষয় কার্যকর করা হয়েছে।

এ বছরের শুরুতেই সিলেটের শাহজালালের মাজারে বোমা হামলার ঘটনা এ ধরনের ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তৎপরতার আরেক প্রমাণ। সিলেটের শাহজালালের মাজার দেশের ধর্মমত-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত। ঐ মাজারে প্রতিদিন তো বটেই, ওরসের সময় হিন্দু-মুসলমান

নির্বিশেষে সকল ধর্মমতের এক মহামিলন ঘটে। এই মাজার-সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই দেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীরা সোচ্চার। সিলেটে তো বটেই, এমনকি মৌলবাদীদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা গোপন রাখেনি। শাহজালালের মাজারে বোমা বিস্ফোরণের কয়েক দিন আগে জামায়াতের মাওলানা দেলায়ার হোসেন সাঈদী মাজার-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন। তারপর ঐ বিস্ফোরণের ঘটনায় এ সকল মৌলবাদী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার কথা উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ থাকে না। কিন্তু ঐ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তও থেমে গেছে। এরপরের ঘটনা আরও তাৎপর্যবাহী। এবারের শাহজালাল মাজারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় খোদ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আহত হন। কিন্তু বাংলাদেশে এসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও যেন চুপসে যায়। তারাও ঐ বোমা রহস্যের কোনো সমাধান করতে পারেনি অথবা চায়নি।

ক্ষমতাসীন জোট এসব বোমা হামলার পেছনে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের হাত আছে বলে প্রচারণায় লিপ্ত হয়। তদন্তের নামে তাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। সিলেটের গুলশান সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণে নিহত আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ ইব্রাহিমকেই ঐ ঘটনার পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে পুলিশ।

এসব বোমা-গ্লেনেড হামলার ধারাবাহিকতায় ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্লেনেড হামলা মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী

কর্তৃক দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির বিনাস সাধনের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পেছনে আরও বড় পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয়। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার ওপরও আঘাত করার চেষ্টা করা হয় বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দুই নেত্রীকে বিদায় প্রদানও এ ধরনের পরিকল্পনার অংশ থাকতে পারে। এটা বোঝা যায়, দেশী-বিদেশী শক্তির মহলপুষ্ট একটি চক্র পরিকল্পিতভাবেই এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের অবস্থান থাকার কারণে এসব ঘটনার কোনো তদন্ত-হদিস হচ্ছে না। বিএনপি-আওয়ামী লীগ কোনো সরকারই ওই তদন্ত নিয়ে এগুতে পারেনি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন চলছে জিয়াউল হক সিমট্রাম। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়াউল হকের কথা আমরা ভুলে যাইনি। ভুলে যাইনি তার কর্মকাণ্ডের কথাও। ক্ষমতায় এসে আশির দশকের শুরু থেকে মৌলবাদীদের

পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছিলেন তিনি। জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসি দিলেন জিয়াউল হক। সম্পর্ক গড়ে তুললেন জঙ্গি মৌলবাদী দল জামায়াত, মুসলিম লীগের সঙ্গে। জিয়াউল হকের রাষ্ট্রীয় শেল্টারে পাকিস্তানে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকলো জঙ্গি মৌলবাদ। তৈরি হলো সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। ঘটলো আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি। এই মৌলবাদী অপশক্তি এক সময় চলে গেল জিয়াউল হকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তারপর দেশী-বিদেশী চক্রান্তের শিকার হয়ে নিহত হলেন জিয়াউল হক। রয়ে গেল জঙ্গি মৌলবাদ। যার মূল্য পাকিস্তানকে এখনো দিতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে জেনারেল মোশারফ ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করছেন মৌলবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের শক্তি এতটাই বেড়ে গেছে যে, মোশারফকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে মৌলবাদী রাজাকাররা বেড়ে উঠেছে। এ দায় থেকে মুক্ত নন বঙ্গবন্ধুও। জেনারেল এরশাদ মৌলবাদীদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে এবং প্রশ্রয় দেয়। শেখ হাসিনা বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে কাছে টেনে নিয়েছেন জামায়াত-সাকাটোদের। জিয়া তাদের করেছেন ক্ষমতার অংশীদার। আংশিক নয়, মৌলবাদের টার্গেট সম্পূর্ণ ক্ষমতা দখল। সে লক্ষ্যই এখন চলছে তাদের অপতৎপরতা।

জামায়াত-সাকাটো-আমিনীদের প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ। এটা তারা ভালো করেই জানে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের ঐক্য হওয়ার নয়। আওয়ামী ভোট জামায়াত-সাকাটোর পাবে না। তাই দল হিসেবে আওয়ামী লীগ দুর্বল হলে তেমন একটা লাভ নেই জামায়াত-সাকাটো-আমিনীদের। লাভ আছে বিএনপি দুর্বল হলে। কারণ বিএনপির অবস্থা যত খারাপ হবে তত ভালো হবে জামায়াত-সাকাটো-আমিনীদের অবস্থা। তাই এদের এখন একটাই লক্ষ্য বিএনপির ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ করা। জোট সরকার বার্থ হলো দায়ের পুরোটাই নিতে হবে বিএনপিকে।

সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে জামায়াত।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের গ্রেনেড আক্রমণের বিষয়টি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী নেতাদের হত্যা করা ছিল টার্গেট। অবশ্যই প্রধান টার্গেট ছিলেন শেখ হাসিনা। যেন ১৫ আগস্টের পুনরাবৃত্তি। একটি বা দু'টি গ্রেনেড শেখ হাসিনার ট্রাকের ভেতরে পড়লেই উদ্দেশ্য সফল হতো। অনেকটা প্রাকৃতিক কারণে সফল হয়নি এই অপারেশন। একজন সামরিক বিশেষজ্ঞের মতে, 'গ্রেনেড যারা ছুঁড়েছে তারা দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে



প্রতিদিন নিহত হচ্ছে মানুষ। যাদের পরিচিতি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাম বা সাধারণ। নিহতের তালিকায় কোনো মৌলবাদী নেই। মৌলবাদীদের কোনো সমাবেশে বোমা বা গ্রেনেড বিস্ফোরণও হচ্ছে না

এই গ্রেনেড ছোঁড়া সম্ভব নয়। ট্রাক লক্ষ্য করেই তারা গ্রেনেড মেরেছিল। বাতাসের কারণে গ্রেনেডগুলো ঠিক জায়গা মতো এসে পড়েনি। বাতাসে 'সুয়িং' হয়ে ট্রাকের আশপাশে পড়েছে।

হে গ্রেনেডে নিহত হননি শেখ হাসিনা। তাকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে গুলি। হাসিনাকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন বডিগার্ড মাহবুব। এ থেকে বোঝা যায় জঙ্গিদের দুটি দল সক্রিয় ছিল। একটি দল গ্রেনেড ছুঁড়েছে অন্যদল গুলি করেছে। যার কিছুই দেখেনি গোয়েন্দারা!

শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতারা নিহত হলে অবস্থা কী হতো? জোট সরকারের পতন ছিল প্রায় অনিবার্য। বিএনপির এই পতনের পুরো সুফল ভোগ করতো জামায়াত। লাভ হতো সাকাটো-আমিনীদের। ক্ষতি হতো বাংলাদেশের জনগণের।

সব দেশে সব কালে দেখা গেছে মৌলবাদী মানবতাবিরোধী অপশক্তি আবির্ভূত

হয়েছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবরূপে। দানবেরা হত্যা করেছে তাদের স্রষ্টাদের। এই দানবদের তাড়বে স্বাধীন বাংলার মাটি আজ ক্ষতবিক্ষত। খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ রক্ত আর লাশে একাকার। সমগ্র দেশ এক মৃত্যু উপত্যকা। প্রতিদিন নিহত হচ্ছে মানুষ। যাদের পরিচিতি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাম বা সাধারণ। নিহতের তালিকায় কোনো মৌলবাদী নেই। মৌলবাদীদের কোনো সমাবেশে বোমা বা গ্রেনেড বিস্ফোরণও হচ্ছে না। এটাও প্রমাণ করে অনেক কিছু।

রক্তাক্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নির্দেশ নিয়েছেন যেকোনো উপায়ে খুঁজে বের করতে হবে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের। কিন্তু খালেদা জিয়ার নির্দেশ প্রশাসন শুনবে এমনটা বিশ্বাস করতে পারছে না জনগণ। কারণ ইতিপূর্বে মৌলবাদী সন্ত্রাসী বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার নির্দেশ মেনে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি বাংলা ভাইকে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানায় শাস্তি হয়নি কোনো পুলিশের। সেই পুলিশ প্রশাসন জঙ্গি সন্ত্রাসীদের ধরবে এমনটা বিশ্বাস করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। মৃত্যু উপত্যকায় অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছেন শেখ হাসিনা। আওয়ামী নেতারা। আইডি রহমান যদিও বাঁচতে পারলেন না।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবরা কখনো বাঁচিয়ে রাখে না তার স্রষ্টাকে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় আক্রান্ত হবেন খালেদা জিয়া, বিএনপি। এটা এতদিন খালেদা জিয়া এবং বিএনপির একটি অংশ ছাড়া সবাই বুঝতে পারছিল। এখন সম্ভবত খালেদা জিয়া এবং বিএনপির এই অংশটি বুঝতে পারছে তারাও নিরাপদ নয়, দানবদের হাত থেকে।

দাবি উঠেছে আন্তর্জাতিক তদন্তের। এ দাবি আওয়ামী লীগের নয়, সমগ্র জাতির। নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রয়োজন আন্তর্জাতিক তদন্তের। পুলিশের মতো বিচার বিভাগীয় তদন্তের ওপরও মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনাটা খালেদা জিয়া এবং বিএনপির জন্য জরুরি।

সামনের সময়টাকে বিএনপি কীভাবে অগ্রসর হবে, তার ওপর নির্ভর করছে খালেদা জিয়া এবং বিএনপির ভাগ্য, বাংলাদেশেরও।